



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 932 - 938

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার : একটি পর্যালোচনা

যুবরাজ রায়

গবেষক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

Email ID: juboroy123@gmail.com

 0009-0008-6385-2362

ও

ড: বিশ্বজিৎ দাশ

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ও ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধক

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

Email ID:

 0009-0003-8500-814X

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Chalantika,
Mobile Library,
Rabindranath
Tagore,
Santiniketan,
Social Activity of
Library, Five
Law of LIS.

Abstract

In this paper present an overview of Rabindranath Tagore's perspective on libraries and their social, educational, and cultural significance. The discussion begins by outlining the foundational elements of his library philosophy, his belief in the holistic development of individuals through knowledge, cultural refinement, and social upliftment. Tagore viewed the library not merely as a repository of books but as a dynamic humanistic institution dedicated to nurturing learning, creativity, and community consciousness. Within the educational frameworks of Santiniketan and Sriniketan, he positioned the library as a centre for exploratory learning, self-directed study, and creative expression. The elaborates on Tagore's innovative initiative, the 'Chalantika' mobile library, which carried books to rural communities and ensured access to knowledge for all. This pioneering model demonstrated his commitment to taking knowledge to the doorsteps of common people, aligning closely with modern library science concepts such as outreach services, user-centred services, and information democracy. Overall, provides a comprehensive account of the humanistic, educational, and social dimensions of the library as envisioned by Rabindranath Tagore.

Discussion

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) একাধারে দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, কবি ও মানবতাবাদী চিন্তক, যিনি মানুষের সার্বিক বিকাশকে তাঁর চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছিলেন। গ্রন্থাগার বিষয়ে তাঁর যুগান্তরকারী প্রবন্ধ 'লাইব্রেরি' বালক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রি:, যখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বছর। এই প্রবন্ধে একজন কবির গ্রন্থাগার বিষয়ক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ

দেখা যায় তদানিন্তন ভারতবর্ষে আর কেও ভাবতে পারেন নি। পরবর্তীতে ১৯২৫ সালে তাঁর ‘চলন্তিকা’ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ধারণা সাধারণ মানুষের গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পৃক্ততা (সংযোগ) এক ভিন্ন অর্থ বহন করে। নোবেল জয়ী (১৯১৩) কবি সাধারণ মানুষের পাঠস্পৃহা বাড়ানোর যে নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন সেই কারণে তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান জগতে স্থায়ী আসন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯২৮ খ্রি: গ্রন্থাগারের ‘লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য’ নিয়ে একটি আসাধারণ প্রবন্ধ রচনা করেন যা গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে বাইবেল স্বরূপ। আমরা এই প্রবন্ধে মুখ্যত তাঁর এই তিনটি কাজ নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

১. ‘লাইব্রেরি’ (১৮৮৬ খ্রি:) প্রবন্ধ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘লাইব্রেরি’ প্রবন্ধটি ‘বালক’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রি: (১২৯২ বঙ্গাব্দে) এবং পরবর্তীতে তা ‘বিচিত্র’ প্রবন্ধ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪ বছর বয়সে ‘লাইব্রেরি’ প্রবন্ধটি লেখেন। এটি তাঁর প্রথম প্রবন্ধ লাইব্রেরির উপরে। যেখানে তিনি লাইব্রেরির ধারণা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছেন –

“মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত।”^১

‘মহাসমুদ্রের কল্লোলধ্বনির’ সাথে তুলনা করেছেন লাইব্রেরিকে, কারণ এটি মানবজাতির সব চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতার একটি সম্মিলিত রূপ। এই প্রবন্ধটি লাইব্রেরিকে কেবল বইয়ের সমষ্টি হিসেবে না দেখে, বরং এক গভীর ও আধ্যাত্মিক স্থান হিসেবে বর্ণনা করে, যা মানুষের মনকে বিভিন্ন অনুভূতি ও জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করে। তিনি আরও বলেছেন যে লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান মানুষের মনকে এক নতুন দিক দেয় এবং তাকে উন্নত করে। লাইব্রেরি এটি শুধু বইয়ের সংগ্রহশালা নয়, বরং এটি মানব জ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার, যা অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে।

“লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি।”^২

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন লাইব্রেরিতে জ্ঞানের অসংখ্য শাখা, বিষয় ও দিক একসঙ্গে মিলিত হয়। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, প্রযুক্তি, সব ধরনের জ্ঞান এখান থেকে নানা দিকে বিস্তার লাভ করেছে। পাঠক লাইব্রেরিতে প্রবেশ করে নিজের আগ্রহ ও প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো পথে অগ্রসর হতে পারে। এই ধারণাই ‘Universe of Knowledge’ যেখানে লাইব্রেরি একটি কেন্দ্রবিন্দু, আর প্রতিটি বই এক একটি নক্ষত্র বা পথ, যা মানুষকে নতুন জ্ঞান ও উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়। লাইব্রেরিয়ান এখানে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন, যিনি পাঠককে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

“অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে - কোনোদিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ, সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।”^৩

রবীন্দ্রনাথ এই উক্তির মাধ্যমে লাইব্রেরিকে এক গভীর আধ্যাত্মিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলছেন, যারা মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সেই ঋষি বা মহাপুরুষরা মানুষকে জাগতিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে ওঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, মানুষ কেবল নশ্বর দেহের সমষ্টি নয়, বরং সে অমৃতের সন্তান, যার নিবাস এই দিব্যধামে। এই সত্যটি তাঁরা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। লাইব্রেরি হল সেই লিখিত প্রজ্ঞার নীরব ভাণ্ডার। এখানে বইয়ের পাতায় পাতায় সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, যা পাঠকের কাছে জ্ঞান ও অমৃতের বার্তা পৌঁছে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দেশ-বিদেশ এবং অতীত-বর্তমান থেকে প্রতিদিন আমাদের কাছে জ্ঞানের যে চিঠি বা বার্তা আসছে, তার সঠিক উত্তর দেওয়া আমাদের কর্তব্য। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানবসভ্যতা নতুন নতুন আবিষ্কার করছে, মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করছে এবং দার্শনিক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটছে। লাইব্রেরি হল সেই মাধ্যম, যার মধ্য দিয়ে আমরা এই বিশ্বজনীন জ্ঞানপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারি। কিন্তু আমরা যদি শুধুমাত্র স্থূল ও তাৎক্ষণিক বিষয়ে মগ্ন থাকি, তবে

আমরা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। দুটি-চারটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লেখা মানে বিশ্বমানের জ্ঞানের পরিবর্তে শুধু পৃষ্ঠীয় বা ক্ষণস্থায়ী তথ্যের চর্চা করা। তাই রবীন্দ্রনাথ ‘লাইব্রেরি’ প্রবন্ধে বলছেন -

“দেশ-বিদেশ হইতে অতীত বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব! সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতোছে, বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতাই লেখা থাকবে!”^৪

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকীর্ণতা নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। অন্য সকল জাতি যখন তাদের মহৎ কাজ কর্মের দ্বারা ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নাম উজ্জ্বল করছে, তখন বাঙালিরা কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতায়, অর্থাৎ আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখছে। এটি কেবল রাজনৈতিক পরাধীনতারই নয়, মানসিক দৈন্যেরও প্রতীক। লাইব্রেরির মতো জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে এসেও বাঙালি যদি বিশ্বচেতনা ও মানবজাতির মহৎ কর্মের প্রতি উদাসীন থাকে, তবে তা জাতির প্রগতিককে বাধাগ্রস্ত করবে। রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান শুধু বই পড়ার আহ্বান নয়, বরং জাগতিক তুচ্ছতা পরিহার করে মননশীলতা, বিশ্ববোধ এবং আত্মপরিচয়ের মহৎ সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করার আহ্বান দিয়েছেন। লাইব্রেরি হল সেই সাধনার কেন্দ্রবিন্দু, যা ব্যক্তিকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে এক মহৎ বিশ্ববোধের সঙ্গে যুক্ত করে।

“বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।”^৫

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও চিন্তাভাবনা যখন বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে মিলিত হবে, তখন তা এক নতুন ও উন্নত সংস্কৃতির সৃষ্টি করবে। এটি শুধু বাঙালির গৌরবের বিষয় নয়, বরং মানব সভ্যতার এক সম্মিলিত সৃজনশীলতার অংশ। লাইব্রেরি এমন একটি স্থান যেখানে এই বিশ্বসংগীতের সুর তৈরি হতে পারে, কারণ এখানে দেশ-বিদেশের জ্ঞান ও সংস্কৃতি মিলিত হয়। এই উক্তিটি কেবল লাইব্রেরি প্রসঙ্গে নয়, বরং সমগ্র বাঙালির আত্মজাগরণের একটি গভীর বার্তা। তিনি বাঙালিকে তার সুপ্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের ভাষায় কথা বলতে এবং বিশ্বের জ্ঞান ও সংস্কৃতির মহাসমুদ্রে নিজেদের অবদান রাখতে উৎসাহিত করেছেন। লাইব্রেরি সেই পথ খুলে দেয়, যেখানে বাঙালি নিজেকে জানতে পারে এবং বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক সমৃদ্ধ বিশ্ব গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ‘লাইব্রেরি’ প্রবন্ধে বলছেন -

“শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায় তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতোছে? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি একপাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গ থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘ-প্রাণ ও স্বল্প-প্রাণ পরম ধৈর্য্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।”^৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগারকে কেবল বইয়ের ভাণ্ডার হিসেবে না দেখে, মানব হৃদয়ের উত্থান-পতনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাবনার গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, লাইব্রেরি শুধু বই সংরক্ষণ করে না, বরং মানুষের চিন্তা, আবেগ, এবং আবিষ্কারের এক নীরব সাক্ষী হয়ে থাকে। শঙ্খের ভেতর যেমন সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়, তেমনি লাইব্রেরির নীরবতার মধ্যেও মানব হৃদয়ের হাজারো আবেগের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা যেন একেকটি হৃদয়ের উত্তাল আবেগ বা শান্ত অনুভূতির প্রকাশ। একজন পাঠক যখন একটি বই পড়েন, তখন তিনি লেখকের হৃদয়ের উত্থান-পতনের সাথে একাত্ম হয়ে যান, যা তাকে এক গভীর মানবীয় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে।

লাইব্রেরিতে কেবল একই মতাদর্শের বই থাকে না, বরং বিপরীত মতবাদও পাশাপাশি অবস্থান করে। দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান সব বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা বইগুলো এখানে একসাথে থাকে, যেন তারা দুই ভাই, যারা তর্ক-বিতর্ক সত্ত্বেও এক ঘরে বাস করে। আর এই সহাবস্থান পাঠককে একটি উন্মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করতে শেখায় এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে উৎসাহিত করে। লাইব্রেরিতে কিছু বই আছে যা মহৎ সাহিত্য বা দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করে, যা দীর্ঘকাল ধরে মানুষকে প্রভাবিত করে আসছে। আবার কিছু বই সাময়িক বা স্বল্পস্থায়ী বিষয় নিয়ে লেখা। কিন্তু

লাইব্রেরিতে উভয় প্রকার বই-ই সমান গুরুত্ব পায়। এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ একে অপরকে উপেক্ষা না করে সহাবস্থান করে। রবীন্দ্রনাথ এখানে লাইব্রেরিকে একটি মানবিক কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরেছেন, যা কেবল বইয়ের সংগ্রহ নয়, বরং মানব হৃদয়ের চিরন্তন উত্থান-পতনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এখানে জ্ঞান, আবেগ, দর্শন, এবং ইতিহাসের সব ধারা এসে মিলিত হয় এবং পাঠককে এক গভীর মানবীয় অভিজ্ঞতার স্বাদ দেয়।

২. ‘চলন্তিকা’ (১৯২৫) গ্রন্থাগারের ধারণা : ‘চলন্তিকা’ গ্রন্থাগারের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯২৫ সালে, যার প্রথম প্রাথমিক সংগ্রহ ছিল মাত্র ২০০টি বই। ১৯২৭ সালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আরও ৭০টি বই দান করেন। পরবর্তী কালে বইয়ের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায়—

- ১৯২৫ সালে হয় : ২০০টি বই
- ১৯৩৭ সালে হয় : ১২০০টি বই
- ১৯৪০ সালে হয় : ১৫০৪টি বই

এছাড়া ১৯৩৯ সালে মোট ২৭৯৩টি বই পাঠকদের থেকে ইস্যু করা হয়েছিল। প্রথমদিকে ‘চলন্তিকা’র দুটি মোবাইল শাখা গ্রন্থাগার ছিল— ১. বোলপুর। ২. গোলপাড়া (বীরভূম জেলা)।

গ্রন্থাগার সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরবর্তীতে আরও তিনটি শাখা-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়- বন্দগোড়া, সান্তালপাড়া ও বেনুরিয়া। এরপর বোলপুর ও গোলপাড়া শাখার অধীনে দুটি করে উপশাখাও গঠিত হয়। এইভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ‘চলন্তিকা’র শাখা কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫টি, যেগুলি অবস্থিত ছিল — দ্বারান্ডা, কালিকাপুর, কামারপাড়া, পায়েল, যাদবপুর, সেহেলা, নূরপুর, রায়পুর, সুপুর, রাজাতপুর, লোহাগড়, সালোণে, গোলপাড়া, রূপপুর এবং দেবগ্রাম।^১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারা ছিল মানবকল্যাণ ও সমাজ গঠনমুখী। তাঁর শিক্ষাদর্শ, সমাজভাবনা ও গ্রামীণ পুনর্গঠন প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ‘চলন্তিকা গ্রন্থাগার’ বা ‘ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার’ ধারণা। এই ভাবনার মূল লক্ষ্য ছিল, জ্ঞানকে গুটিকয়েক মানুষের সম্পত্তি না রেখে সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। তাঁর চিন্তায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিয়ে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল -

২.১. জ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম : রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞান কেবল উচ্চশ্রেণির জন্য সীমাবদ্ধ থাকলে সমাজের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারকে তিনি দেখতেন জ্ঞানবিতরণের একটি গণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে। ‘চলন্তিকা’ মোবাইল লাইব্রেরির মাধ্যমে তিনি এই ধারণাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন, যেখানে বই ও জ্ঞান মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়।

২.২. শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ ও সামাজিক সমতা : তাঁর মতে, শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার ঘটলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিহার্য। শান্তিনিকেতন ও তার আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে ‘চলন্তিকা’র শাখা প্রতিষ্ঠা এই লক্ষ্যেরই প্রতিফলন।

২.৩. সক্রিয় ও গতিশীল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র : রবীন্দ্রনাথের মতে গ্রন্থাগারে বই সাজিয়ে রাখার স্থান নয়, বরং একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠান, যা পাঠক সৃষ্টি করে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে উৎসাহিত করে। ‘চলন্তিকা’ ছিল তারই প্রতীক, একটি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি যা স্থান ও সময়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে।

২.৪. সমাজ সংস্কারের উপকরণ : গ্রন্থাগারকে রবীন্দ্রনাথ সমাজ সংস্কারের একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকরাই একটি দেশ ও সমাজের প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারে। ‘চলন্তিকা’ শুধু বই বিতরণ করত না, এটি একটি গ্রামীণ সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারকে দেখেছিলেন সমাজসংস্কারের হাতিয়ার হিসেবে। যেখানে পাঠক, বই ও সমাজ এক অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের মধ্যে যুক্ত। তাই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ধারণা আজও শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাজে এক প্রেরণাদায়ক

আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ও সমাজচিন্তায় গ্রন্থাগার কেবল জ্ঞানসংগ্রহের প্রতিষ্ঠান নয়, বরং মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের এক জীবন্ত কেন্দ্র।

৩. ‘লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য’ (১৯২৮ খ্রি:) প্রবন্ধ : ‘লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য’ প্রবন্ধটি ১৯২৮ সালে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৭ বছর বয়সে ‘লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য’ প্রবন্ধটি লেখেন। প্রথম ‘লাইব্রেরি’ প্রবন্ধটির পর দীর্ঘ ৪৩ বছর পরে ‘লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য’ প্রবন্ধটি লেখেন। স্বভাবতই এই প্রবন্ধটিতে তাঁর লাইব্রেরির প্রতি সুগভীর চিন্তা ভাবনা প্রকাশ পায়। এই প্রবন্ধে তিনি লাইব্রেরিকে সমাজের সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও শিক্ষামূলক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। তাঁর মতে, লাইব্রেরির সাফল্য বইয়ের পরিমাণে নয়, বরং বই পাঠকের জীবন ও সমাজচেতনায় কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, সেটিই মূল মানদণ্ড। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি -

“লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।”^৮

এই বক্তব্যে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে সংরক্ষণ লাইব্রেরির একটি অন্যতম দায়িত্ব হলেও প্রকৃত সার্থকতা নিহিত বইয়ের সক্রিয় ব্যবহারে। পাঠক যখন নিয়মিত ও সৃজনশীলভাবে জ্ঞানকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করে এবং সমাজে জ্ঞানপ্রসার ঘটে, তখনই একটি লাইব্রেরি তার সত্যিকারের উদ্দেশ্য পূরণ করে। এ প্রসঙ্গে লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্বের ব্যাপ্তির কথা বলেছেন -

“যে বইগুলি লাইব্রেরিয়ান সংগ্রহ করতে পেরেছেন কেবল তাদের সম্বন্ধেই লাইব্রেরিয়ানের কর্তব্য আবদ্ধ নয়। তাঁর জানা থাকা চাই, বিষয়বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কী কী বই প্রকাশিত হচ্ছে।”^৯

লাইব্রেরিয়ানের কর্তব্য কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত বইসমূহ সম্পর্কে অবহিত থাকা বা সেগুলোর তত্ত্বাবধানেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং, রেফারেন্স সেবার মূল দর্শন অনুযায়ী, একজন দক্ষ লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব হলো নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান-চাহিদা চিহ্নিত করে পাঠকের জন্য প্রাসঙ্গিক নতুন উপকরণের সন্ধান প্রদান করা। এই ধারণাটি Reference Service-এর মূল নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; কারণ রেফারেন্স সেবার অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যবহারকারীর তথ্যপ্রয়োজন অনুযায়ী Current Awareness Service (CAS), Selective Dissemination of Information (SDI) প্রদান করা। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, -

“নিখিল ভারত লাইব্রেরি পরিষদ থেকে ত্রৈমাসিক ষান্মাসিক বা বাষিক এমন একটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত যাতে অন্তত ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল ভালো বই প্রকাশ হচ্ছে যথাসম্ভব তার বিবরণ প্রকাশ করা যেতে পারে।”^{১০}

অর্থাৎ বিশেষ করে মাসিক পত্রিকা এবং নতুন বইগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বই ও পত্রিকা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এই চিন্তা অনেক গভীর এবং বাস্তবসম্মত। তিনি যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন, সেগুলি সত্যিই লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বইয়ের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা ও তথ্য প্রদানের মাধ্যমে পাঠকের মধ্যে বই সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করা যেতে পারে। মূলত এই ধরনের পত্রিকা, bibliography বা গ্রন্থতালিকার একটি আধুনিক রূপ হিসেবে কাজ করবে, যেখানে নির্বাচিত প্রকাশনার তালিকা শুধু প্রদানই নয়, পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ করার জন্য সংক্ষিপ্ত book review বা সমালোচনামূলক আলোচনা সংযুক্ত থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেছিলেন, নিখিল ভারত লাইব্রেরি পরিষদ থেকে একটি ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক, বা বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত থাকবে—

- বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত বইয়ের পর্যালোচনা ও তালিকা।
- বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের বিস্তারিত বিবরণ।
- বিভিন্ন বয়স এবং শ্রেণির পাঠকদের জন্য বইয়ের সুপারিশ।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবিত পত্রিকা শুধুমাত্র বইয়ের পর্যালোচনা এবং তথ্য প্রদান করবে না, বরং এটি পাঠকদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং অন্যান্য বিষয়ে গভীর আগ্রহ তৈরি করতে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার নতুন এক দিক উন্মোচিত হতে পারে, যেখানে বই এবং পত্রিকা কেবল সংগ্রহের জন্য নয়, বরং পাঠকদের জন্য কার্যকরী তথ্য সরবরাহের উৎস হিসেবে কাজ করবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেছিলেন, নিখিল ভারত লাইব্রেরি পরিষদ যেন বই নির্বাচনের নীতি নির্ধারণ ও প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই চিন্তাধারা পরবর্তীকালে ভারত সরকারের Raja Rammohun Roy Library Foundation (RRRLF)-এর বই নির্বাচনী ও প্রচারনীতির সঙ্গে মিল রাখে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগার ও পাঠকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের এক দার্শনিক ধারণা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন-

“শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে তোলে।”^{১১}

এই বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ পাঠক ও গ্রন্থাগারের পারস্পরিক নির্ভরতার কথা স্পষ্ট করেছেন। অর্থাৎ, গ্রন্থাগার কেবল বই সংরক্ষণের স্থান নয়, বরং এটি এমন এক সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যা পাঠককে শিক্ষিত, চিন্তাশীল ও সামাজিকভাবে সচেতন করে তোলে। সুতরাং, এই বক্তব্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারিকের ভূমিকাকে এক শিক্ষক, প্রচারক ও মানবসম্পর্ক নির্মাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ‘User Centered Service’ ধারণার সঙ্গেও সুস্পষ্টভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তিনি মনে করেন, লাইব্রেরির মূল উদ্দেশ্য বই ধার দেওয়া নয়, বরং পাঠাভ্যাস ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে পাঠককে গড়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে গ্রন্থাগারিকের মধ্যে সহজতা, সৌজন্য ও প্রচারমনস্কতা থাকা আবশ্যিক অর্থাৎ এমন মনোভাব যা পাঠকের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং জ্ঞানচর্চার পরিবেশকে উৎসাহিত করে। তিনি গ্রন্থাগারকে এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কল্পনা করেছিলেন, যেখানে পাঠক কেবল বই ধার নেন না, বরং জ্ঞান ও মানসিক উন্নতির অংশীদার হন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

“এই প্রবন্ধে আমি যে কথাটি বলতে চেয়েছি সেটা সংক্ষেপে এই যে, লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্ট ভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ-সংগ্রহ ও সংরক্ষণ তার গৌণ কাজ।”^{১২}

এই বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারের সেবা ভিত্তিক দর্শনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, গ্রন্থাগারের মূল ভূমিকা শুধু বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সেই জ্ঞানকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের বৌদ্ধিক চাহিদার সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ স্থাপন করাই হলো গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, গ্রন্থাগারের প্রাণ নিহিত থাকে সংরক্ষণে নয়, পাঠকের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ স্থাপনের মধ্যেই। তাই লাইব্রেরিয়ানের অন্যতম দায়িত্ব হয়ে ওঠে personalized service, যার মাধ্যমে প্রতিটি ব্যবহারকারীর ব্যক্তি-ভেদে তথ্যপ্রয়োজন শনাক্ত করে তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক বই, সূত্র, রেফারেন্স ও রিসোর্স সুপারিশ করা হয়। এর ফলে লাইব্রেরি একটি স্থির সংগ্রহস্থল হিসেবে নয়, বরং গতিশীল জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়; যেখানে সংগ্রহ-উন্নয়ন ও সংরক্ষণ গৌণ এবং পাঠককে কেন্দ্র করে সেবা প্রদানই মুখ্য। তিনি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে গ্রন্থাগার একটি সক্রিয় ও প্রাণময় প্রতিষ্ঠান, এর মূল উদ্দেশ্য পাঠকের মানসিক বিকাশ, চিন্তার পরিধি বিস্তার এবং ধারাবাহিক জ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করা। তাই গ্রন্থাগারের সাফল্য শুধুমাত্র বইয়ের সংখ্যা বা সংগ্রহের বিশালতায় নির্ভর করে না; বরং নির্ধারিত হয় পাঠকের সঙ্গে বইয়ের কার্যকর, অর্থবহ ও গতিশীল সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতার মাধ্যমে।

৪. উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাগার ভাবনা ছিল তাঁর সামগ্রিক শিক্ষা ও সমাজ দর্শনেরই অঙ্গ। তিনি গ্রন্থাগারকে কখনই বইয়ের নিষ্পন্ন ভাণ্ডার হিসেবে দেখেননি; বরং দেখেছেন এক প্রাণবন্ত, সক্রিয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। তাঁর মতে, লাইব্রেরির কর্তব্য শুধু বই সংগ্রহ নয়, বরং পাঠক সৃষ্টি করা, জ্ঞানস্পৃহা সৃষ্টি করা এবং একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রেরণা সৃষ্টি করা। এই দর্শনেরই যুগান্তকারী রূপায়ণ ছিল তাঁর ‘চলন্তিকা’ বা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ধারণা, যেখানে বই পৌঁছে যায় পাঠকের দ্বারপ্রান্তে। এটি ছিল জ্ঞানকে গণমুখী ও গণতান্ত্রিক করার এক মহৎ প্রয়াস। আজকের ডিজিটাল

যুগে ই-লাইব্রেরি ও মোবাইল লাইব্রেরির ধারণাগুলো রবীন্দ্রনাথের এই দূরদৃষ্টিরই স্বীকৃতি দেয়। তাঁর ভাবনায় গ্রন্থাগারিক হলেন সেই সেতুবন্ধনকারী, যিনি গ্রন্থ ও পাঠকের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। একজন দক্ষ ও মানবিক গ্রন্থাগারিক ছাড়া গ্রন্থাগার কখনই তার পূর্ণরূপ লাভ করতে পারে না। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার হল জ্ঞানচর্চা, মানবিক ও সামাজিক পরিবর্তনের এক কর্মক্ষেত্র। এটি কেবল ইট-কাঠের কাঠামো নয়, এটি একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান, যা ব্যক্তি ও সমাজের অবিরাম উৎকর্ষের পথে এক অম্লান আলোকসুন্দর। তাঁর এই চিন্তাধারা আজও সমান প্রাসঙ্গিক, এবং ভবিষ্যতের গ্রন্থাগার কাঠামো গঠনে এটি একটি মৌলিক দিগ দর্শন হিসেবে বিরাজ করবে।

Reference:

১. 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধ, পৃ. ১
২. 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধ, পৃ. ২
৩. 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধ, পৃ. ৩
৪. 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধ, পৃ. ৩
৫. 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধ, পৃ. ৪
৬. 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধ, পৃ. ২
৭. Tagore, Rabindranath, The Function of a Library: Address of the Chairman, Reception Committee, All India Library Conference, Calcutta, December, Kolkata: Visva-Bharati, August, 1951, Page. 1-6
৮. 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' প্রবন্ধ, পৃ. ২
৯. 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' প্রবন্ধ, পৃ. ৪
১০. 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' প্রবন্ধ, পৃ. ৫
১১. 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' প্রবন্ধ, পৃ. ৩
১২. 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' প্রবন্ধ, পৃ. ৫

Bibliography :

- Nandi, Subodh Gopal, Rural development, library and Rabindranath. XXI IASLIC National Seminar on Information Support for Rural Development, IASLIC; Kolkata, 2004, Page. 79
- Saha, Nimai Chand and Sinha, Keshab Chandra Mr., Rural Libraries in Support of Rural Reconstruction: Tagores' Thinking and Reality. Library Philosophy and Practice, 2012, Page. 867
- Visva Bharati Annual Report, in The VisvaBharati Quarterly, January, 1930, Page.45152
- Sinha, Keshab Chandra, Role of Rabindranath Tagore's mobile library in rural development. Granthagar,2009, Page. 288-291
- Tagore, Rabindranath, Siksha. (Visva-Bharati Granthana Vibhaga; Santiniketan), 1972, Page. 20